# সন্তানকে বুলিং থেকে বাঁচান

*নাঈমা জান্নাত*

আর কিছুদিন পর নতুন নুতন শিশুর পদচারণায় মুখর হবে সারাদেশের বিভিন্ন স্কুলপ্রাঙ্গণ। স্কুল কার্যক্রমের পাশাপাশি অভিভাবক ও শিক্ষকদের যে বিষয়ে বিশেষ নজর রাখা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে বুলিং। আমাদের দেশে এ নিয়ে তেমন একটা উচ্চবাচ্য না হলেও, উন্নত বিশ্বে শিশুদের সঠিক বিকাশের ক্ষেত্রে বুলিং খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ইস্যু। এমনকি ঐ সব দেশে প্রতিবছর ফেব্রুয়ারির শেষ বুধবার এবং সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় বৃহস্পতিবার 'এন্টি বুলিং ডে' পালন করা হয়। এছাড়াও বছরের বিভিন্ন সময়ে তারা বুলিং-বিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন।

বুলিং হলো এক ধরনের মৌখিক, মানসিক বা শারীরিক পীড়ন। ক্ষতি করার উদ্দেশে কোন একজনকে বারবার বিভিন্নভাবে ভয় দেখানো বা আক্রমণ করাই বুলিং। তা হতে পারে ব্যঙ্গ করা, বদনাম করা, লাথি মারা, বিভিন্ন ধরনের কুরুচিপূর্ণ অঙ্গভঙ্গি করা বা উত্যক্ত করা। এমনকি অবহেলা বা এড়িয়ে চলে মানসিক চাপ দেয়াটাও এক ধরনের বুলিং। এক্ষেত্রে দুর্বল কাউকেই বেছে নেয় বুলিংকারী। স্কুল-কলেজে সহপাঠীদের মধ্যে এই বুলিং বিষয়টি ঘটে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে একজন, আবার অনেক ক্ষেত্রে বেশ কয়েকজন মিলে একজনকে বুলিং করে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের একটি জাতীয় জরিপ অনুযায়ী, স্কুল জীবনে কোন না কোন সময়ে ৭০ শতাংশ শিক্ষার্থীই বুলিংয়ের শিকার হয়। এর ফলে তাদের শিক্ষাজীবনে সফলতা অর্জনের ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। যে সব শিক্ষার্থী এর শিকার হয়, তাদের মধ্যে বিষণ্নতা, ভয়, খিটখিটে মেজাজ এবং নিজেকে হেয় করে দেখার প্রবণতা তৈরি হয়। এই বুলিং প্রতিরোধ না করলে সমাজে গঠনমূলক নেতৃত্ব ও সুনাগরিকের অভাব পরিলক্ষিত হয়। তাই আপনার শিশুটি বুলিংয়ের শিকার হচ্ছে কিনা বা কাউকে বুলিং করছে কিনা, দু'দিকেই সজাগ থাকা প্রয়োজন।

বন্ধু ছাড়া জীবন অসম্ভব। এমন স্লোগানের যুগে বন্ধু না থাকাটাই অস্বাভাবিক। বন্ধু থাকলে তাদের সাথে আন্তরিকতা ও সখ্য এবং একে অন্যকে বোঝার ক্ষমতাও থাকবে। অনেক ক্ষেত্রেই বন্ধু-বান্ধব না থাকলে আমরা ছেলে বা মেয়েটিকে অসামাজিক বলি। কিন্তু আমরা খতিয়ে দেখি না, অস্বাভাবিক এই বিষয়টি তার মধ্যে কীভাবে আসলো। সে কোন ধরনের নির্যাতনের শিকার হচ্ছে কিনা। কোনভাবে সে তার স্কুল, কলেজ বা বন্ধুমহলে বুলিং-এর শিকার বা অপদস্থ হয়েছে কিনা।

একইভাবে আপনার সন্তান অন্যকে স্কুলে বুলিং করছে কিনা, তা তার কিছু আচরণ পর্যবেক্ষণ করলেই বুঝতে পারবেন। যেমন বারবার সহিংসতায় জড়িয়ে পড়া, কথায় কথায় তর্কে জড়ানো, অন্যকে ছোট করা, স্কুলে বেশির ভাগ সময়ে নানা কারণে অভিযুক্ত হওয়া, তার কাছে নতুন নতুন জিনিসপত্র পাওয়া, কৃতকর্মের দায় স্বীকার না করা, অন্যকে অপদস্থ করে এমন বন্ধুবান্ধব থাকা, সবসময় জেতার নেশা এবং শীর্ষে থাকার চিন্তাভাবনা পোষণ করা। বাবা-মায়েরা মনে করেন, একজন আরেকজনকে মানসিক চাপে রাখার বিষয়টি বয়ঃসন্ধিকালে তাদের চরিত্র গঠন করে এবং এর মাধ্যমেই স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে সে। কিন্তু বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব শিশু-কিশোর মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়, তারা ধীরে ধীরে সমাজবহির্ভূত হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে সে বিষণ্নতায় আক্রান্ত হয় এবং আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। নিজের যোগ্যতা ও দক্ষতাকেই দোষারোপ করতে শুরু করে সে। এক পর্যায়ে স্কুল বা কলেজে যেতে তার অনীহা তৈরি হয় বলে বিভিন্ন গবেষণায় উঠে এসেছে। ভার্জিনিয়ার এক গবেষণায় দেখা গেছে, শুধুমাত্র টিজিং ও বুলিংয়ের কারণে সেখানে ২৯ শতাংশেরও বেশি শিক্ষার্থী স্কুল থেকে ঝরে পড়ে।

কোন শিক্ষার্থী যাতে বুলিংয়ের শিকার না হয়, সেজন্য বাবা-মায়ের প্রথম দায়িত্ব হলো সন্তানের সাথে তার প্রাত্যহিক জীবনযাপন নিয়ে খোলামেলা কথা বলে সমস্যা চিহ্নিত করা, তাকে বুলিং সম্পর্কে অবহিত করা এবং মানসিক চাপ কমানোর সাথে সাথে বুলিং মোকাবেলায় সাহায্য করা। আপনার সন্তানের সব ধরনের কষ্ট লাঘবে কার্যকর পদক্ষেপ নিন। প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞের পরামর্শও নিতে পারেন।

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো আমরাও যদি বুলিং-বিরোধী কার্যক্রম হাতে নিই, তবে আশা করা যায় আমাদের নতুন প্রজন্ম আরো সুন্দরভাবে বিকশিত হবে।

*চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানে এমফিল গবেষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়;*
*E-mail : nznurany@yahoo.com*